বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত পূণর্বিন্যাসে বাণিজ্যনীতির ভূমিকা

—এস, এম, আলী আক্কাস

১. সূচনাঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন দিকে কাঠামোগত অসংবদ্ধতা রয়েছে। এই অসংবদ্ধতা যেমন আমাদের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ কাঠামো ক্ষেত্রে (যথা সরকারী-বেসরকারীসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কর ব্যবস্থায়) বিরাজমান, তেমনি তা বহিঃস্থ তথা আন্তর্জাতিক লেনদেন পর্যায়েও সুস্পষ্ট। অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অর্থনীতির বহু অভ্যন্তরীণ অসংবদ্ধতাই প্রকারান্তরে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতায় পর্যবসিত হয়। বাংলাদেশ তার অভ্যুদয়ের পর থেকেই এই আন্তর্জাতিক লেনদেন ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন আই, এম, এফ, এবং বিশ্বব্যাংক তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশকেও তার অর্থনীতির কাঠামোগত বিন্যাসের (Shuctural adjustment) জন্য পরামর্শ দিয়ে আস্‌ছে। বাংলাদেশ এসব পরামর্শের কতটা গ্রহণ করেছে এবং তদনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে কাঠামোগত পুণর্বিন্যাসের জন্য কোন নীতি গ্রহণ করেছে কিনা এবং গ্রহণ করে থাকলে তার ফলাফল কি – এসব বিষয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে। তবে এ প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ভারসাম্য আনয়নে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী কি এবং অনুসৃত বাণিজ্যনীতির সাথে তার সম্পর্ক কি, তা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হবো। আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ তার আন্তর্জাতিক লেনদেনের কারেন্ট একাউন্টে ক্রমাগত যে ঘাটতির সম্মুখীন তাতে শৃংখলা বিধানের জন্য তার আমদানি রপ্তানি নীতিকে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে।

বিষয়টির গভীরে যাওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত শব্দ গুলোর সঙ্গা প্রদান আবশ্যকঃ–

(ক) কাঠামোগত বিন্যাস (খ) লেনদেন ভারসাম্য (গ) লেনদেনের চলতি হিসাব ও (ঘ) বাণিজ্যনীতি।

২. কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সজ্ঞাঃ

ক। **কাঠামোগত বিন্যাস ঃ** এটি— আই, এম, এফ ও বিশ্বব্যাংক প্রবর্তিত প্রত্যয় বা ধারণা। বৈদেশিক দায়গ্রস্থ কোন দেশ প্রতিকূল বহির্দেশীয় পরিস্থিতির শিকার হয়ে স্বীয় অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের উদ্দেশ্যে যখন ভোগ প্যাটার্ণ, সম্পদের পূণঃবরাদ্দকরণ এবং উপকরণ সন্নিবেশ ধারার পরিবর্তন আনে তখন তাকে কাঠামোগত বিন্যাস বলা হয়।

খ। **লেনদেন ভারসাম্য ঃ** প্রত্যেক দেশ অন্যান্য দেশের সাথে পরিচালিত লেনদেনের বেলায় তার হিসাব যে বিশেষ ব্যালেন্স সীট এর আকারে রাখে তাকে লেনদেনের ভারসাম্য বলে।

গ। **লেনদেনের চলতি হিসাবঃ** এটি লেনদেন ভারসাম্যেরই প্রথম ভাগ যাতে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি দেশের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি প্রদর্শন করে । এটি বৈদেশিক বাণিজ্যে সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য দ্রব্য/ সেবা লেনদেনের দৈনন্দিন হিসাব–(এই হিসাব ব্যালেন্স সীট আকারেও রক্ষিত হয়)।

ঘ। **বাণিজ্যনীতিঃ** আমদানি ও রপ্তানি নীতির সমষ্টি। বাণিজ্যনীতি বলতে এ প্রবন্ধে বাংলাদেসের বাণিজ্যনীতির কথাই বলা হয়েছে।

৩. কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসঃ আন্তর্জাতিক আর্থ-সংস্থা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিতঃ

৩.১ কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস- বিশ্বব্যাংক যেভাবে দেখেঃ

আগেই বলা হয়েছে যে, অর্থনীতিতে কাঠামোগত পূণর্বিন্যাসের ধারণাটি বিশ্বব্যাংক ও আই, এম, এফ,–এর উদ্ভাবিত। ঋণ দায়গ্রস্থ দেশগুলির প্রতিকূল বৈদেশিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলায় তাদের অর্থনীতিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হলে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত–এ সম্পর্কিত পরামর্শের সমষ্টিকেই এক অর্থে কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস বলা যায়। ধারণাটি বিশ্বব্যাংক বা আই, এম, এফ,–এর উদ্ভাবিত বা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে উক্ত দু'টি প্রতিষ্ঠান দায়গ্রস্থ দেশগুলির আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসেবে কোন মারাঅক সমস্যা দেখা দিলে তা কাটিয়ে উঠার জন্য ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে কতিপয় শর্তের বিণিময়ে। এসব শর্ত সংশ্লিষ্ট অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত। তাই এখন দেখা দরকার অর্থনীতির কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস বলতে বিশ্বব্যাংক বা আই, এম, এফ, কি বুঝাতে চায়।

৩.১১ পূণর্বিন্যাস ঃ কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস ঃ মারাত্মক প্রতিকূল বৈদেশিক পরিস্থিতিতেও একটি স্থায়ী প্রবৃদ্ধি কার্যকর রাখার প্রচেষ্টায় ভোগ প্যাটার্ণের পরিবর্তন, সম্পদের পূণর্বরাদ্দকরণ এবং অর্থনীতির উপকরণ সমাবেশ ধারায় পরিবর্তন আণয়ন প্রচেষ্টার নাম কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস। এই পূণর্বিন্যাস সাধনের তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ হলো, লেনদেনের চলতি একাউন্টের উন্নতি এবং ব্যয়ের মাত্রা এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে আসা যাতে স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন–লোকসান সর্বনিম্ন হয় এবং অর্থনীতি পুনরায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের সামর্থ নিশ্চিত করতে পারে।

চলতি হিসাবের (কারেন্ট একাউন্ট) অবস্থার উন্নতি "সার্বিক ব্যয় সংকোচন" এবং "স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ নীতি" অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভব হতে পারে। স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ বা সার্বিক ব্যয় সংকোচন নীতির বাস্তবায়ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যাধীন পণ্যের অভ্যন্তরীণ ভোগ কমিয়ে এবং বহির্ভূত পণ্যের মূল্যের পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব। উভয় নীতির উদ্দেশ্যই হলো আমদানি সংকোচন ও রপ্তানি বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উন্নতি। কিন্তু, কৌশল দুটির কার্যকারিতা সময়ের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। পূণর্বিন্যাসের কার্যক্রম বিলম্বিত হলে অর্থাৎ বৈদেশিক ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পুর্ণভাবে তিরোহিত হওয়ার মত চূড়ান্ত অবস্থার উদ্রেক হলে লেনদেনের চলতি হিসাবের ঘাটতি কমানোর জন্য কোন স্বাভাবিক পথ খোলা থাকে না। এমতাবস্থায়, পূণর্বিন্যাস ক্রিয়াকর্মের বেশীর ভাগই ব্যয় সংকোচন নীতির ন্যায় রূঢ় পদক্ষেপের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ নীতির সুফল পেতে দীর্ঘ সময় লাগে। ব্যয় সংকোচন নীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যাধীন পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনমাত্রা ব্যাহত করে না। বরং তা প্রভাব ফেলে এসব পণ্যের রপ্তানি ও আমদানি মাত্রার উপর। অন্য কথায় বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উপর। অপর পক্ষে, এ নীতির প্রয়োগের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহির্ভূত পণ্যোৎপাদন খাতের মূল্য ও মজুরী অপরিবর্তনশীল হলে শ্রম ও মুলধন বাণিজ্যাধীন খাতে পূণস্থাপিত না হয়ে বরং স্বল্পকালের জন্য হলেও বেকার হয়ে পড়ে। সুতরাং লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতির বিষয়টি বাণিজ্য বহির্ভূত পণ্য উৎপাদন হ্রাস ও বেকারত্ব সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত।

ব্যয়–সংকোচন নীতির এরূপ সম্ভাব্য মারাত্মক পরিণতির প্রেক্ষাপটে সকল দেশেরই উচিত সমস্যার শুরুতেই স্বল্প–ব্যয় পরিগ্রহণ নীতির পরিকল্পিত বাস্তবায়ন যাতে উত্তরণকালে অন্ততঃ স্বল্পতম বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত করে। সময় থাকতে স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণনীতির বাস্তবায়ন তাই একটি দেশকে বৈদেশিক কম উৎপাদন ঘাটতির সম্মুখীন হয়ে একটি সহজ পূণর্বিন্যাস কর্মসূচী গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস কর্মসূচীর দুটো প্রধান দিক আছে বলে বিশ্বব্যাংক মনে করে। **এক,** রাষ্ট্রীয়খাতের পরিধি ও তৎপরতার যৌক্তিকরণ এবং **দুই,** বেসরকারী খাতের জন্য উৎসাহ কাঠামোর (Incetive structure) উন্নতিবিধান। এ দুটো দিকই চূড়ান্ত বিবেচনায় কোন না কোনভাবে লেনদেনের চলতি হিসাব বা বাণিজ্যিক ভারসাম্যের সাথে জড়িত। বিষয় দুটির বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

৩.১২ সরকারী খাতঃ অনেক দেশেই সরকারী খাতের ঘাটতি সার্বিক সরকারী ঘাটতির একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। অর্থনীতির কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস বা সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সরকারী খাতের বিপুল ঘাটতির বর্তমান পরিসর ও কারণ কতটা যুক্তিসিদ্ধ তা মুল্যায়ন করে দেখা । যদি দেখা যায়, ভোগ্যপণ্যের ভর্তুকি প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পণ্য মূল্যই সরকারী ঘাটতির কারণ, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন এই নির্দিষ্ট শ্রেণীর ভোক্তার জন্য এই ভর্তুকি ? তারা কি সমাজের সব চাইতে দরিদ্রতম শ্রেণী ? এটাই কি দরিদ্রতম শ্রেণীর কাছে আয় পৌছানের সর্বোত্তম উপায় ?

সরকারী খাতে ঘাটতির অপর একটি কারণ সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতা। অদক্ষতার উদ্ভব ব্যবস্থাপনাকারীর জওয়াবদিহীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার জন্য হতে পারে অথবা এমন ধারণা থেকেও উদ্ভব হতে পারে যে, ঘাটতি বা লোকসান তো সরকার কর্তৃকই মিটানো হবে।

জন-উপযোগ বিবেচনায় একচেটিয়া কারবার ঠেকানোর জন্য সরকারী মালিকানা যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্যের বেলায় তা মোটেই গ্রহণীয় নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, অনেক উন্নয়নশীল দেশে সরকারী সঞ্চয় এবং সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সরকারী খাতের পরিধি ও তৎপরতা পূণর্মূল্যায়ণ করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

৩.১৩ বেসরকারী খাতকে উৎসাহ প্রদানঃ বেসরকারী খাতে উৎসাহ প্রদানের নীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক ও আই, এম, এফ, "ট্রান্সপারেন্ট" এবং "অটমেটিক" এই দুই ধারণার ব্যবহার করতে আগ্রহী। উৎসাহ প্রদান নীতির এ বৈশিষ্ট্য দুটির মূল কথা হলো, সমজাতীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উৎপাদক কোন ক্রমেই বৈষম্যমূলক বা আলাদা ভাবে আচরণ পাবেন না। সকল ধরণের পরিমানগত বিধিনিষেধ এবং পরিমানগত বরাদ্দ বৈষম্যমূলক আচরণের সামিল। উদাহরণ স্বরূপ বিনিয়োগ লাইসেন্স ও বিধি নিষেধ, আমদানী লাইসেন্স এবং বৈদেশিক মুদ্রার পরিমানগত বরাদ্দ, রপ্তানী লাইসেন্স ইত্যাদির

কথা উল্লেখ করা যায়। এধরণের নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের। সুতরাং উৎসাহ কাঠামো সংস্কারের প্রথম ধাপ হলো, সকল ধরণের পরিমাণগত নিয়মানুগ ও বরাদ্দ তুলে দিয়ে মূল্য, কর, ট্যারিফ ও ভতুর্কির ভিত্তিতে নতুন উৎসাহ কাঠামো গড়ে তোলা। এ পর্যায়ে বাণিজ্য নীতিতে নিম্নোক্ত সংস্কার সাধনের প্রয়োজন রয়েছে।

৩.১৪ বাণিজ্য নীতিতে সংস্কারঃ প্রায় সকল দেশেই কৃষি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং উভয়ে মিলে যে পণ্য উৎপাদন করে তা রপ্তানি হয় এবং আমদানি বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব দেশের অনেকগুলিতে অনুসৃত বাণিজ্যনীতি বিদেশী ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা, ট্যারিফ ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় আমদানি বিকল্প ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যকে বৈষম্যমূলকভাবে সহায়তা প্রদান করে। অথচ কৃষি এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এমতাবস্থায় সংস্কারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এমন একটি পক্ষপাতহীন উৎসাহ পদ্ধতি গড়ে তোলা যাতে উভয়ের মধ্যে একটি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংক বা আই, এম, এফ, মনে করে এরূপ পক্ষপাতহীন নীতি গ্রহণ করলে ঐসব অর্থনৈতিক কার্যাবলী উৎসাহিত হবে যা দ্বারা স্বল্প ব্যয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বা সঞ্চয় করা সম্ভব হবে। উপরোক্ত নীতির সারকথা এই যে, একটি উন্নত বাণিজ্য নীতির উদ্দেশ্য কেবল মাত্র রপ্তানী বৃদ্ধিই হওয়া উচিত নয়।

বাণিজ্য নীতির পক্ষপাতহীনতার একটি বড় ধরণের তাৎপর্য ধরা পড়ে যখন পূণর্বিন্যাসের অস্ত্র হিসেবে স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ নীতিকে বেছে নেয়া সম্ভব হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যাধীন পণ্যের দক্ষ খাতকে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমেই সঠিক স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব।"একটি সর্বোত্তম রপ্তানি ও আমদানি বিকল্পনের সম্প্রসারণ যৌগ"(The best mix of exports and expansion of imports substitutes) তখনই অর্জিত হতে পারে যখন বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহ নীতি কার্যকরী করা হয়। আমদানির উপর অতিরিক্ত ট্যারিফ বা পরিমানগত বিধিনিষেধ অদক্ষ- এটা অনেকে মনে করেন। এবং তাঁদের মতে এই অদক্ষতা- জনিত অপব্যয় দ্বারা সংশ্লিষ্ট খাতে কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস করা যেত। মারাত্মক প্রতিকূল বৈদেশিক পরিস্থিতিতে ভোগ্য পণ্যের উপর করারোপের মাধ্যমে সম্পদ পূণর্বন্টনের বেলায় সবচাইতে সঠিক পদক্ষেপ হলো আমদানিকৃত অথবা অভ্যন্তরীণ ভাবে উৎপাদিত পণ্য নির্বিশেষে ভোগকর আরোপ করা।

উপরোক্ত কাঠামোগত পূণর্বিন্যাসের সাধারণ আলোচনায় বিশ্বব্যাংক ও আই, এম, এফ, এর দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে।[২] এর সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়, লেনদেনের

চলতি হিসাবের উন্নতি করতে হলে ব্যয় সংকোচন নীতি ও স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহ নীতি (General expenditure reduction and expenditur switching policies) গ্রহণ করা যেতে পারে। নাজুক পরিস্থিতিতে অবস্থার তাৎক্ষণিক উন্নতির জন্য ব্যয় সংকোচন (বা ব্যয়-কর্তন) নীতি গ্রহণই শ্রেয়। এজন্য আমদানি ব্যয় কমিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি সংকুচিত করতে হবে। এতে উৎপাদন পড়ে যাওয়া এবং কর্মসংস্থান পরিস্থিতির অবণতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে থাকেলে স্বল্প ব্যয় পরিগ্রহণ নীতির বাস্তবায়ন বেশী সুফলদায়ক। দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসাবের অবণতির পিছনে সরকারী ঘাটতির কারণ প্রবল হলে সরকারী খাতের পরিধি ও তৎপরতা পূর্ণমুল্যায়ন করে দেখতে হবে। প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রত্যাহার, অলাভজনক সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার রয়েছে। তৃতীয়তঃ বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের উৎসাহ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এজন্য বাণিজ্য নীতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে। পক্ষপাতযুক্ত পরিমানগত নিয়ন্ত্রণের স্থলে সাধারণভাবে মূল্য,কর, ট্যারিফ ইত্যাদির ভিত্তিতে নতুন উৎসাহ কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। চলতি বাণিজ্য নীতিতে যন্ত্রযোগে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য (Manufactured product) যে সব সুযোগ পায়, তার রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়, কৃষি পণ্য সে সুযোগ পায় না। উভয় পণ্যকে একই মানদণ্ডে বিচার করতে হবে, সর্বোপরি, সার্বিক নীতিমালায় বাজার অর্থনীতির উপর জোর দিতে হবে, যা চূড়ান্ত বিবেচনায় অর্থনৈতিক এবং ন্যায় নীতির পরিচায়ক।

৪. কাঠামোগত বিন্যাস ও বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতি

এপর্যন্ত আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, বিষয় হিসেবে কাঠামোগত বিন্যাস খুবই ব্যাপক ও যার সাথে একটি অর্থনীতির বহুবিধ খাত ও অর্থনৈতিক নীতি সমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এ সকল অসংখ্য খাত ও নীতির মধ্যে বাণিজ্য নীতির ভূমিকা চিহ্নিত করাই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। একটি অর্থনীতির প্রকৃত ভারসাম্যহীনতা তার আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ধরা পড়ে। আমদানি এবং রপ্তানি সেই চলতি হিসাবের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অন্য কথায় লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যের সিংহভাগই বণিজ্যিক ভারসাম্যের ফলশ্রুতি। তাই চলতি হিসাবের ভারসাম্যের উন্নতির সাথে বাণিজ্যনীতি তথা আমদানি রপ্তানী নীতির সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে।

৪.২ বাংলাদেশ তার অর্থনীতির কাঠামোগত বিন্যাস সাধনের জন্য আই, এম, এফ ও বিশ্বব্যাংকের অপরাপর পরামর্শ (যেমন সরকারী খাতের ভূমিকা সীমিত করে ব্যয় সাশ্রয়, ভর্তুকি পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা) বাস্তবায়ন করলেও বাণিজ্য নীতির বেলায় তার প্রয়োগ একটু ভিন্নধর্মী। বাংলাদেশ তার আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসাবে বিপুল ঘাটতি সত্ত্বেও আমদানি কমায়নি। বরং লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতির জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। **(সারণী-১ দ্রষ্টব্য)**। উদ্দেশ্য, আমদানি বৃদ্ধির চাইতে রপ্তানি বৃদ্ধি দ্রুততর করে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা যাতে লেনদেনের চলতি হিসাবের উপর স্বাভাবিক ভাবেই অনুকূল প্রভাব ফেলা যায়। বাংলাদেশ ১৯৮১–৮২ থেকে ১৯৮৮–৮৯ পর্যন্ত যে সকল আমদানি ও রপ্তানি নীতি ঘোষণা করেছে, তাতে কোন বছরেই তার লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতির সাথে আমদানি নীতিকে সম্পৃক্ত করা হয় নাই। লেনদেনের চলতি হিসাবের ঘাটতি কমিয়ে আনার সাথে রপ্তানি নীতির একটা যোগসূত্র থাকলেও তা ততটা গুরুত্ব সহকারে নেয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।[৩] কারণ ৮০ এর দশকের প্রথম তিন বছরে লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যহীনতা কাটানোর লক্ষ্যে রপ্তানী নীতিতে কোন কিছুই বলা হয়নি। ১৯৮৩–৮৪ থেকে ১৯৮৭–৮৮ পর্যন্ত গৃহীত রপ্তানী নীতিতে বিষয়টির উল্লেখ দেখা যায়। ১৯৮৮–৮৯ সালে তা আবার রপ্তানি নীতি তালিকা থেকে বাদ পড়ে। ১৯৮৯–৯১ এর দ্বিবার্ষিক রপ্তানী নীতিতে এটির পূণঃ সংযোজন হয়।

৪.৩ বাস্তবে উপরোক্ত নীতির প্রয়োগ কতটা হয়েছে তা সারণী–২ বিশ্লেষণ করলেই পরিস্কার হবে। এতে দেখা যায় ১৯৮০–৮১ থেকে ১৯৮৭–৮৮ পর্যন্ত আমদানি বেড়েছে গড়ে বছরে ২.৫% (খাদ্য ছাড়া)। অপর পক্ষে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রকৃত মূল্যে গড়ে বছরে ৬.৮%।

৪.৪ মনে রাখা আবশ্যক যে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় তার রপ্তানি আয়ের আড়াই গুণেরও বেশী (১৯৮৭–৮৮)। এমতাবস্থায় রাপ্তানি বৃদ্ধির হার আমদানি বৃদ্ধি হারের চাইতে বেশী হলেও প্রকৃত অর্থে তা লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে অনুকূল প্রভাব রাখছে কিনা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। অন্য কথায় অনুসৃত বাণিজ্য নীতি প্রকৃতই লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতির সহায়ক হচ্ছে কিনা ? বিষয়টির একটি সন্তোষজনক জওয়াব দেয়া যেতে পারে অভ্যন্তরীণ জাতীয় আয় সংশ্লিষ্ট (জিডিপি) কতিপয় অনুপাত উপস্থাপণের মাধ্যমে। রপ্তানি আয় দিয়ে আমদানির কত অংশ কেনা যায় এটাও একটি উৎকৃষ্ট পরিমাপক।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

সারণী-১ঃ আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য ১৯৮১-৮৮
(মিলিয়ন ডলারে)

	১৯৮০-৮১	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮
রপ্তানী (এফ, ও, বি)	৭১১	৬৮৬	৮১১	৯৩৪	৮১৯	১,০৭৪	১,১৭০
আমদানী (সি এণ্ড এফ)	– ২,৫৩৩	– ২,২৪৬	– ২,৩৫৩	– ২,৬৪৭	– ২,৩৬৪	– ২,৬২০	– ২,৮৯৫
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	– ১,৮২২	– ১,৫৬০	– ১,৫৪২	– ১,৭১৩	– ১,৫৪৫	– ১,৫৪৬	– ১,৭২৫
সার্ভিস (নীট)	১৫	– ১১৩	– ৩৩	– ৭৮	– ১২৫	– ১৫১	– ১৬৭
প্রাপ্তি	২৭৪	২৩০	২৭৯	২৮৬	২৬০	২৬২	২৯০
প্রদান	– ২৫৯	– ৩৪৩	– ৩১২	– ৩৬৪	– ৩৮৫	৪১৩	৪৫৭
বেসরকারী হস্তান্তর (নীট)	৩৭৯	৬৫৫	৬২৭	৪৭৭	৫৮৬	৭৩১	৭৪০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	– [illegible]	[illegible]	– ৯৪৮	– ১,৩১৪	– ১,০৮৪	– ৯৬৬	– ১,১৫২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিশ্বব্যাংক ষ্টাফ প্রাককলন। এটি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশঃ এডজাষ্টমেন্ট ইন দি এইটটিজ এণ্ড শর্ট টার্ম প্রসপেকটস", মার্চ ১০, ১৯৮৮ পৃঃ ১৯ থেকে গৃহীত।

সারণী-২ঃ আমদানী ও রপ্তানীর বৃদ্ধি হার

(শতকরা হারে)

	১৯৮০–৮১	১৯৮১–৮২	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮	১৯৮১–৮৮ গড়
রপ্তানী (স্থির মূল্যে)	১১.৪	৪.০	৪.৮	৪.৭	– ৩.৪	১১	২১.৪	– ০.৬	৬.৮
আমদানী সূচক	১০০	৯৯.২	৯৬.৬	১০২.৭	১২৩.০	১০৬.৪	১১৬.৫	১২৬.৭	২.৫%
(১৯৮০–৮১=১০০)									
খাদ্য বাদে									
আমদানী মূল্য সূচক	১০০	৯৯.৭	৯১.৪	৯০.৪	৪৫.০	৮৭.৭	৮৮.৭	৯০.২	

উৎসঃ পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিশ্বব্যাংক ষ্টাফ প্রাককলন বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশঃ এডজাষ্টমেন্ট ইন দি এইটটিজ এণ্ড শর্ট টার্ম প্রস্পেকটস্"—মার্চ ১০, ১৯৮৮ থেকে গৃহীত।

৪.৫ ১৯৮১–৮২ অর্থ বছরে লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্য অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদন এর ১২% ছিল। এই হার ক্রমাগত কমে ১৯৮৬–৮৭ অর্থ বছরে হয়েছে ৫.৫%। এটি বাংলাদেশের লেনদেন পরিস্থিতির উন্নতির পরিচায়ক নিঃসন্দেহে। খাদ্য ব্যতীত সার্বিক আমদানির গতি প্রকৃতি গত বছরগুলোতে (১৯৮০ এর পর থেকে) স্থবির থাকায় এবং রপ্তানি আয় গড়ে প্রতিবছর প্রায় ৭% বাড়ায় পরিস্থিতির মৌলিক উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়। ১৯৮০–৮১ তে রপ্তানি আয় দিয়ে যেখানে ২৮% আমদানী ব্যয় নির্বাহ করা যেত ১৯৮৭–৮৮ তে তা ৪১% এ দাড়িয়েছে **(সারণী–৩ দ্রষ্টব্য)**।

৪.৬ তবে লেনদেনের চলতি হিসাবের ক্রমোন্নতি কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ভারসাম্যের কারণ নয়। প্রকৃত পক্ষে ১৯৮০–৮৮ মেয়াদের প্রথম এবং শেষ বৎসর ছাড়া বাণিজ্য ঘাটতি স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। সারণী–১ দ্রষ্টব্য। একই সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যের সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। চলতি হিসাবের ঘাটতি ১৯৮০–৮১ এর ১,৪২৮ মিলিয়ন ডলার থেকে কমে ১৯৮৭–৮৮ তে ১,১৫২ মিলিয়ন হয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতির স্থিতিশীল অবস্থায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যের উন্নতির কারণ অন্যত্র। সেটা হলো বেসরকারী হস্তান্তর যার প্রায় সবটাই প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে অর্থ প্রেরণ। এর পরিমান ১৯৮০–৮১ এর ৩৭৯ মিলিয়ন ডলার থেকে ক্রমাগত বেড়ে ১৯৮৭–৮৮ অর্থবছরে ৭৪০ মিলিয়ন হয়েছে। লেনদেনের চলতি হিসাবের অপর উপাদান নীট সার্ভিস চার্জ তেমন বাড়েনি– ১৯৮২–৮৩ অর্থবছরে ১৯৩ মিলিয়ন ডলার হয়েছে। সুতরাং উপরের বিশ্লেষণে এটা সুস্পষ্ট যে, লেনদেন ভারসাম্যের (ঘাটতি পরিস্থিতির) উন্নতির কারণ হলো বাণিজ্য ঘাটতির স্থিতিশীলতা এবং বেসরকারী হস্তান্তর খাতের উন্নতি।

বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা আবার আমদানীর তুলনায় রপ্তানি হার বৃদ্ধির কারণে। সুতরাং রপ্তানির বৃদ্ধি হার লেনদেন ঘাটতি পরিস্থিতির স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হয়েছে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি তার আন্তর্জাতিক লেনদেন ভারসাম্যের অবনতি রোধে ধনাত্মক প্রভাব রাখতে পেরেছে স্বীকার করতে হবে।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশ তার অর্থনীতিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। সরকারী খাতের সীমা ও তৎপরতার যৌক্তিকরণ, বেসরকারী খাতের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহ কাঠামো গড়ে তোলা এবং একটি লক্ষ্যাভিসারী বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে তার অর্থনীতির কাঠামোগত বিন্যাসের চেষ্টা করছে। এ প্রচেষ্টার ফলে বিশেষ করে চলতি

সারণী-৩ঃ লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতি

(শতকরা হারে)

	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮
১. জি, ডি, পি- এর শতকরা হারে চলতি হিসাবের ভারসাম্য	- ১০.০	- ১২.০	- ৯.১	- ৬.৭	- ৮.২	- ৭.০	- ৫.৫	
২. জিডিপি-এর শতকরা হারে সরকারী বাজেট ভারসাম্য	- ৯.১	- ৮.৭	- ১১.২	- ৯.২	- ৭.৫	- ৭.২	- ৮.১	
৩. জি, ডি, পি, প্রবৃদ্ধি হার	৬.৮	০.৮	৩.৬	৪.২	৩.৬	৪.৯	৪.১	
৪. রপ্তানী আমদানী অনুপাত	২৮.০							৪১.০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

দশকে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতির ফলে লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে অনুকূল প্রভাব পড়েছে।

পাদটীকাঃ

১. সেলোস্কাই, এমঃ " এডজাষ্টমেন্ট ইন দি এইটটিজঃ এন ওভারভিউ অব ইস্যুজ" ইন " ফিন্যাস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট" এ কোয়াটারলি জার্নাল অব দি ওয়ালর্ড ব্যাংক এণ্ড ইন্টারন্যাশলনাল মনেটরি ফাণ্ড, জুন ১৯৮৭।

২ ঐ পৃঃ ২–৫।

৩. বিশ্বব্যাংক ঃ বাংলাদেশ ঃ এডজাষ্টমেন্ট ইন দি এইটটিজ এণ্ড শর্ট টার্ম প্রসপেক্টস পৃঃ ৩৫।

গ্রন্থ নির্দেশিকাঃ

১। বিশ্ব ব্যাংকঃ " বাংলাদেশঃ এডজাষ্টমেন্ট ইন দি এইটটিজ এণ্ড শর্ট টাম প্রস্পেক্টসন মার্চ, ১৯৮৮।

২। বিশ্বব্যাংক ঃ ওয়ার্লড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৮৯, অধ্যায় ঃ " এডজাষ্টমেন্ট এণ্ড গ্রোথ ইন দি এইটটিজ এণ্ড নাইন্টিজ " পৃঃ ৬–১৯।

৩। বিশ্বব্যাংক ঃ ওয়ার্লড ডেবেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৮৮ অধ্যায় " ফিস্ক্যাল পালসি ফর ষ্ট্যাবিলাইজেশন এণ্ড এডজাষ্টমেন্ট" পৃঃ ৫৫–৭৮।

৪। বিশ্বব্যাংক ঃ ওয়ার্লর্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৮৭, অধ্যায় ঃ " বেরিয়ার্স টু এডজাষ্টমেন্টস্ এণ্ড গ্রোথ ইন্দি ওয়ার্লর্ড ইকনমি" পৃঃ ১৪–৩৫।

৫। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৮–৮৯

৬। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৭–৮৮

৭। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৬–৮৭

৮। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৫–৮৬

৯। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৪–৮৫

১০। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৩-৮৪

১১। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮২-৮৩

১২। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮১-৮২

১৩। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮০-৮১